Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোম্মানা মোহাম্মদ আবদুল বাতেন

রোলঃ 216021578

১ জুন, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোম্মানা মোহাম্মদ আবদুল বাতেন

রোলঃ 216021578

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রোম্মানা মোহাম্মদ আবদুল বাতেন, আইডিঃ 216021578 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে সময়ের গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Rommana

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

রোম্মানা মোহাম্মদ আবদুল বাতেন

আইডিঃ 216021578

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:..1

কোরআণের আলোকে সময়ের গুরুত্ব...2

হাদিসের আলোকে ইসলামে সময়ের গুরুত্ব...5

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈ তাবিঈনদের সময়ের মূল্যায়ন 8

কিছু চমৎকার কাহিনি...11

দুনিয়ার কাজে সময় ব্যয়...13

এক বণিকের ঘটনা 14

কাজ তিন প্রকার...15

দায়িত্ব অনেক বেশি...16

প্রকৃত জীবন হল যৌবনকাল..17

যৌবন সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)- এর উক্তি 18

ছাত্রদের অলস মানসিকতা 19

অলসতা ও ঘুম দূর করার পদ্ধতি..20

সাফল্য অর্জনকারী তালেবে ইল্মের গুণাবলী...20

'ইমাম মুআফফিক বিন কুদামাহর উপদেশ' 23

ভবিষ্যতের আশায় ধোঁকা খেয়ো না...24

অবসর সময়...25

সময় নষ্ট করার কতিপয় কাজ 26

ইন্টারনেট 26

মোবাইল ফোন 27

খেলাধূলায় সময় নষ্ট করা 28

খারাপ কাজে লিপ্ত থাকা ও খারাপ সঙ্গ 29

সময়ের গুরুত্ব দেয়ার পদ্ধতি..29

কি ভাবে সময়কে কাজে লাগবে এমন আরো কিছু আমল 31

দুঃখিত, সময় ফুরিয়ে গেছে!..34

ভূমিকা:

সময় জীবনের অমূল্য সম্পদ। মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। এর যথার্থ ব্যবহারের মধ্যে সাফল্য নিহিত। আল্লাহ তাআলার অগণিত নিয়ামতের মধ্যে সবচেয়ে দামি নিয়ামত হচ্ছে **সময়**।আরবিতে সময়ের প্রতিশব্দ ওয়াক্তুন। এর বহুবচন আওক্কাতুন। ইংরেজিতে সময়ের প্রতিশব্দ Time, period, hour। সময় বা কাল একটি পুরাতন পরিভাষা। তা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট মেয়াদে নানা ঘটনার অতিক্রমকে বোঝানো হয়। ইসলামে সময়ের গুরুত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে । মুসলিমদের জীবনে প্রতিদিনের কাজগুলি সময় দেখে সঠিকভাবে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। ইমাম আবু ওয়াফা ইবনে আকীল রহ: বলেন, 'জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান সবাই এ কথায় একমত যে, মানুষের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুঁজি হলো সময়। সময় ও অবসর মূল্যবান সম্পদ। কেননা মানুষের দায়িত্ব ও করণীয় অধিক, কিন্তু সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায়।'
আরবিতে প্রবাদ বাক্য আছে;

الوقت أثمن من الذهب

যার বাংলা অর্থ হলো, 'সময় সোনার চেয়ে দামি।' প্রবাদটিতে যদিও সময়কে সোনার সাথে তুলনা করা হয়েছে, প্রকৃতার্থে সময়কে তুলনা করার মতো পরিপক্ক কোনো বস্তু নেই!

জীবনে সফলতা, নিজেদের লক্ষ্যপানে পৌঁছতে এবং পরকালে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর বিকল্প নেই। লক্ষ্যহীন মানুষ সময় অপচয় করে। যাদের জীবনের লক্ষ্য আছে তারা সময়কে কাজে লাগায়।সময়ের যথাযথ ব্যবহারের ওপরই মানুষের জীবনের পাহ নির্ভর করে। একজন মানুষ সময়কে যেমন মূল্যায়ন করবে সে তেমনি ফল পাবে। তাই সময়ের কাজ সময়ে করাই ভালাে। একবার যে সময় অতীত হয়ে যাবে সে সময় আর কখনাে ফিরে আসবে না। সময়কে মূল্যায়ন করতে হবে

সবকিছুর উর্ধ্বে। সময়ের সদ্ব্যবহারই পারে আমাদের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে স্মরণীয় করে রাখতে।

সময়ের ব্যাপারে আরবীতে আরও একটি কথা প্রচলিত আছে,

الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك

তার অর্থটা এমন, 'সময় হচ্ছে তরবারির ন্যায়, তুমি তাকে কাটতে না পারলে সে ঠিকই তোমাকে কেটে ফেলবে।' এ প্রবাদের ব্যাখ্যা করবার প্রয়োজন নেই। মর্মার্থ শাব্দিক অর্থ হতেই বোধগম্য। তবে, একটু স্পষ্ট করে বলতে হলে এভাবে বলতে হবে, 'সময়কে কেউ কাজে লাগালে যেভাবে সে উপকৃত ও লাভবান হয়, ঠিক উল্টোভাবে কেউ সময়ের অপব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ হয়। 'সময়' একজনের বেলায় রহমত, বরকত ও মঙ্গল বয়ে আনে, আবার দ্বিতীয়জনের বেলায় অভিশাপ ও পরিতাপ ছাড়া আর কিছুই রাখে না।' এ কারণে সবসময় আমাদেরকে সময়ের ইতিবাচক ব্যবহারে মনোনিবেশ করতে হবে।

কোরআণের আলোকে সময়ের গুরুত্ব

পৃথিবীর কোনো শক্তিই সময়ের গতিশীলতাকে রোধ করতে পারে না। সময় কখনো থামতে জানে না, সে আপন গতিতে সদা চলমান। সময় কখনো ক্লান্ত হয় না, তাই তার বিশ্রামেরও প্রয়োজন হয় না। সময়ের গুরুত্ব বোঝাতে মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র আল কুরআনে সময়ের শপথ করে বলেন,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

‘সময়ের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।’ (সূরা আসর-১-৩)।
প্রসিদ্ধ তাফসিরবিদদের মতে আল্লাহ যখন তার সৃষ্ট জীবের প্রতি শপথ করেন উদ্দেশ্য মানুষকে সেই বিষয়ে স্ববিশেষ গুরুত্বারোপ করা। এখানে মানুষের দৃষ্টিকে সময়ের দিকে ফিরানো এবং মহান আল্লাহর কল্যাণমূলক কাজ ও নিদর্শনের প্রতি সতর্কতা আরোপ করাই উদ্দেশ্য।

অধিকাংশ তাফসিরবিদ বলেন, মানুষের সব কর্ম, গতিবিধি, উঠাবসা ইত্যাদি সব যুগের মধ্যে সংঘটিত হয়। সূরায় যেসব কর্মের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেগুলোও এই যুগ-কালেরই দিবা-রাত্রিতে সংঘটিত হবে। এরই প্রেক্ষিতে যুগের শপথ করে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (সা’দী, ইবন কাসীর)।
ইসলাম প্রতিটি কাজের একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ছাড়াও অধিকাংশ বিষয়সমূহ সময়ের মালায় গাঁথা। আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

নিশ্চয় নামাজ মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে। (সূরা নিসা : ১০৩)। এখানে নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট সালাত আদায়ের তাকিদ দিয়ে সময়ের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

পৃথিবীর শুরু থেকেই রাব্বুল আলামিন চাঁদ-সূর্য, আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিচালনা করে আসছেন। সূর্য প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে উদিত হয়, আবার নির্দিষ্ট সময়ে অস্ত যায়। যার দ্বারা সময়ের গুরুত্ব খুব সহজেই বোঝা যায়।
সুরা ইউনুসের ৫ এবং ৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

'মহামহিম আল্লাহ সূর্যকে তৈরি করেছেন বিচ্ছুরিত আলোর উৎসরূপে আর চাঁদকে করেছেন জ্যোতির্ময় (সে আলোর প্রতিফলন)। তিনি চাঁদের কক্ষপথ ও কলাকাল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর, দিন ও সময়ের হিসাব নির্ণয় করতে পার। আল্লাহ এসব অনর্থক সৃষ্টি করেননি। জ্ঞানীদের জন্য তিনি তাঁর বাণী বিশদভাবে বয়ান করেন।নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনের মাঝে এবং যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীনে, সবই হল নিদর্শন সেসব লোকের জন্য যারা ভয় করে।'

এ ছাড়াও আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের একাধিক জায়গায় দিনরাতের কসম করেছেন। রাতদিনের কসম করে বলেছেন,

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾

'শপথ রাতের, যখন তা আচ্ছন্ন করে। শপথ দিনের, যখন তা উদ্ভাসিত করে।' (সুরা আল লাইল : ১-২)। এখানে রাতদিনের কসমে বান্দাদের কল্যাণের চিন্তা ও গবেষণার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফজর ও ১০ রাতের কসম করে আল্লাহতায়ালা বলেছেন,

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾

'শপথ ফজরের, শপথ ১০ রাতের।' (সুরা ফজর : ১-২)। অন্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾

‘শপথ সকাল ও পূর্বাহ্নের; শপথ রাতের, যখন তা গভীর হয়।’ (সুরা দোহা : ১-২)। এসব আয়াত দ্বারা সময়ের প্রতি অপরিসীম গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

সময় শব্দটি তিন অক্ষরের ছোট শব্দ হলেও এর ব্যাপ্তিকাল অনেক বড়। সৌরবছরে ৩৬৫ দিন আর চন্দ্র বছরে ৩৫৪ দিন। ঘণ্টার হিসাবে ২৪ ঘণ্টা এবং মিনিটের হিসাবের দিক দিয়ে ১৪৪০ মিনিট। এ সময় হতে এক ঘণ্টা বা এক মিনিট চলে যাওয়া মানে প্রকৃতপক্ষে জীবনের একটা মূল্যবান অংশ কমে যাওয়া।
ইসলামের সব কর্মপদ্ধতিতে সময়ের মূল্য লক্ষণীয় পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿٤٥﴾

"যদি আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে ভুপৃষ্ঠে চলমান কাউকে ছেড়ে দিতেন না। কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর যখন সে নির্দিষ্ট সময় এসে যাবে তখন আল্লাহর সব বান্দা তাঁর দৃষ্টিতে থাকবে।"

হাদিসের আলোকে ইসলামে সময়ের গুরুত্ব

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব সাধারণত হাদিসের আলোকে অনেকটা প্রকাশ পায়। হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানি যে সময় একটি মূল্যবান সম্পদ, একটি উপহার, যা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে।
রাসুল (সা.) কী পরিমাণ সময়ের মূল্য দিতেন, তা তার ইবাদত ও আমল থেকে বোঝা যায়। তিনি প্রতিদিন সকালে দোয়া করতেন, ‘হে আল্লাহ! আজ দিনের প্রথম অংশকে আমার জন্য উপকারী বানিয়ে দিন, তার মধ্যাংশকে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং শেষাংশকে শুভ করুন।’ অসংখ্য হাদিসে সময়ের মূল্য ও জীবনের গুরুত্ব প্রদানের তাগিদ রয়েছে।

রাসুল (সা.) বলেন, ‘পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয় আসার আগে গনিমত মনে করো; বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের আগে স্বচ্ছলতাকে, কর্মব্যস্ততার আগে অবকাশকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে।’ (সুনানে বাইহাকি : ১০২৪৮)। একদা রাসূলুল্লাহ (সা.)কে প্রশ্ন করা হলো, সৌভাগ্যবান কারা? তিনি বললেন, সৌভাগ্যবান তারা, যারা দীর্ঘায়ু লাভ করেছে এবং তা নেক আমলের মাধ্যমে অতিবাহিত করেছে। অতঃপর আবার জিজ্ঞেস করা হলো, দুর্ভাগা কারা? তিনি বললেন, দুর্ভাগা তারা যারা দীর্ঘায়ু পেয়েছে এবং তা বদ আমলে কাটিয়েছে বা আমলবিহীন অতিবাহিত করেছে। (তিরমিজি-২৩২৯, মুসনাদে আহমাদ-১৭৭৩৪)।

সময় মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এক আমানত। মৃত্যুর পর আমাদেরকে এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার দরবারে হিসাব দিতে হবে। রাসূল (সা:) বলেছেন : কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে মানুষকে সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। হাশরের কঠিন দিবসে মৌলিক চারটি বিষয়ে মানুষকে প্রশ্ন করা হবে। বিশেষ করে সময় সম্পর্কে প্রধান দু’টি প্রশ্ন করা হবে। ‘কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু’টি সরবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর দরবার থেকে যাওয়ার তাকে অনুমতি দেয়া হবে না) যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে, তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইলম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে তাতে কী আমল করেছে? তার মাল সম্পর্কে, কী উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং তা কোন পথে ব্যয় করেছে? আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন কাজে সে তা ক্ষয় করেছে?’ (তিরমিজি-২৪১৬)

উক্ত হাদিসটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুমেয় যে, প্রতিটি মানুষকে প্রথম প্রশ্নটি করা হবে তার হায়াত সম্পর্কে। আর হায়াত হলো সময়ের সমষ্টি বিধায় বলা যায় প্রথম প্রশ্নটিই করা হবে সময় সম্পর্কে। সুতরাং যে আদম সন্তানই সময়ের অপব্যয় করবে, সে কেয়ামতের দিন রবের দরবারে আটকে যাবে।

সময় নষ্ট করা একপ্রকার আত্মহত্যা। তবে পার্থক্য হলো, আত্মহত্যা মানুষকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করে দেয়। আর সময়ের অপব্যবহার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবিত ব্যক্তিকে মৃত বানিয়ে রাখে। যে মিনিট, ঘণ্টা ও দিনটি অনর্থক নষ্ট হয়ে যায়, যদি মানুষ

তার হিসাব করত, তাহলে তার সমষ্টি হয়ে দাঁড়াত মাস, বছর ও যুগ। যদি কাউকে বলা হয়, তোমার জীবনের ৫ কিংবা ১০ বছর হ্রাস করা হলো, তাহলে নিশ্চিত সে ব্যাকুল ও মর্মাহত হবে। কিন্তু তার জীবনের একটি বিরাট অংশ যে অকারণে নষ্ট করছে, তার প্রতি সে একটুও ভ্রূক্ষেপ করছে না। মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হওয়ার কারণে নেপালিয়নের মতো অজেয় সেনাপতিকেও পরাজিত হতে হয়েছে। যথাসময়ে কর্তব্য আদায় না করায় ব্যর্থতার বোঝা বহন করতে হয়েছিল। সময়ের সদ্ব্যবহারে আসে সুফল। অসদ্ব্যবহারে মেলে হতভাগ্যের হাতছানি।রাসূলুল্লাহ সা:-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ কে?

তিনি বললেন- 'যার আয়ু দীর্ঘ অথচ আমল মন্দ।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৩০)

বুদ্ধিমান মানুষ দিবসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান মনে করে কাজ সম্পাদন করে থাকেন। রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিদিন সকাল বেলা উম্মতের কল্যাণের জন্য দোয়া করে বলতেন,

'اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِها '

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের সকালের/ভোরের কাজে বরকত দিন। (তিরমিযি)। একদা রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত ইবনে উমর (রা.)-কে লক্ষ করে বললেন, 'হে ইবনে উমর! তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে বসবাস করো যেন তুমি অপরিচিত বা মুসাফির।'

হুজুর সা:-এর পবিত্র জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাঁর পুরো জীবনই ছিল সময়ের তালে নির্দিষ্ট নিয়ম মাফিক।

সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈ তাবিঈনদের সময়ের মূল্যায়ন

ইসলামের প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত সমস্ত পুণ্যবান সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে-তাবেয়ী, বুযুর্গ ওলামায়ে কেরাম সবাই সময়ের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। তারা সময় নষ্ট করাকে আত্মহত্যার মতোই জঘন্য অপরাধ মনে করতেন। হজরত আবু বকর (রা.) বলতেন, 'সময়ের চক্র যদিও বিস্ময়কর। কিন্তু মানুষের অলসতা আরো বিস্ময়কর। মানুষের উচিত জীবনের সেই দিনটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করা যা এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, সেখানে কোনো নেক আমল করা হয়নি। হজরত উমর ফারুক (রা.) বলতেন, 'হে আল্লাহ! সময়ের বরকত ও কল্যাণলাভের জন্য আবেদন করছি। তিনি আরো বলতেন, তুমি সন্ধ্যা পেলে সকালের অপেক্ষা করোনা এবং সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করোনা। অন্যত্রে হজরত ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, 'সন্ধ্যায় উপনীত হলে তুমি সকালের অপেক্ষা করোনা। আর ভোর বা সকালে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করোনা। অসুস্থতার পূর্বেই সুস্থতাকে কাজে লাগাও। আর ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে কাজে লাগাও।' এজন্যই ইবনে ওমর (রা.) রাতে ঘুম থেকে উঠে অজু করতেন এবং নামাজ পড়তেন। এরপর পাখির মতো সামান্য সময় ঘুমাতেন । তারপর উঠে অজু করে নামাজ পড়তেন। তারপর সামান্য সময় ঘুমাতেন।আবার উঠে নামাজ পড়তেন। এভাবেই তিনি বারবার করতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা)

হজরত আলী (রা.) বলতেন, বর্তমানে চলমান দিনগুলো তোমাদের জন্য কিতাব বা আমলনামার মতো। তাই উত্তম আমল দ্বারা উহাকে স্থায়ী করে রাখো।

হজরত আবু ওয়াইল থেকে বর্ণিত, একবার হজরত আম্মার (রা.) আমাদের সামনে খুতবা দেন। খুতবাটি ছিল সংক্ষিপ্ত ও অলংকারপূর্ণ। খুতবা শেষে তিনি মিম্বর থেকে নামলে আমরা তাকে বললাম, আবদুল ইয়াকীন, আপনি তো সংক্ষিপ্ত ও বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন। তবে খুতবাটি দীর্ঘ হলে ভলো হতো। তিনি বলেন, নামাজ দীর্ঘ হওয়া ও বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। অতএব, তোমরা নামাজ দীর্ঘ করো বক্তব্য সংক্ষেপ করো।

বিশিষ্ট সাহাবী হজরত আবু দারদা (রা.) মৃত্যুশয্যায় অসুস্থ হয়ে বলেছিলেন, ‘তিনটি বিষয় না থাকলে দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে চাইতাম না। ১. সাওম বা রোজা পালনকালে দ্বিপ্রহরের তীব্র গরমের তৃষ্ণা। ২. গভীর রাতে সিজদাহ দেওয়া। ৩. জিকিরের মজলিশে আলেমদের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসা।

হজরত আবু বকর (রা.) হজরত উমর (রা.)-কে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার সময় উপদেশ দিয়ে বলেছেন, ‘শোনো! দিনে আল্লাহর কিছু কাজ রয়েছে, যা রাতে কবুল হবে না, আর রাতে কিছু কাজ রয়েছে, যা দিনে কবুল হবে না।’ (আল-ওয়াকতু ফি হায়াতিল মুসলিম) তাই তো মুসলিম স্কলাররা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে দিনের সময় ওজনের ‘দাঁড়িপাল্লা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তারা জুমাকে সপ্তাহের, রমজানকে বছরের এবং হজকে জীবনের দাঁড়িপাল্লা গণ্য করতেন। তারা চাইতেন- মানুষ দিনের কাজ দিনে শেষ করুক, সপ্তাহের কাজ সপ্তাহে, মাসের কাজ মাসে এভাবে পুরো জীবনকে কাজে লাগাবে। কারণ, সময় কারো জন্য বসে থাকে না, ফিরেও আসে না।

হাসান বসরি (রহ.) চমৎকারভাবে বলেছেন, ‘ফজর ভেদ করে আলোতে আসা প্রতিটি দিন ডেকে বলে : হে আদম সন্তান! আমি এক নতুন সৃষ্টি। আমি তোমার কাজের ব্যাপারে সাক্ষী। আমার নিকট থেকে রসদ সংগ্রহ করো। কারণ, আমি বিদায় নেওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কখনোই ফিরে আসব না।’ মুমিন ব্যক্তি জীবনের কোনো মুহূর্ত নষ্ট হোক তা পছন্দ করে না। কেননা জীবনের আয়ু অতি সামান্য। পুরো জীবনটাই হলো পরীক্ষা ও যাছাইয়ের মুহূর্ত। আখিরাতে এর পুরস্কার আল্লাহর হাতেই। বিখ্যাত তাবেয়ী হজরত হাসান বসরী (র.) বলেন, ‘আমি এমন লোকদের (সাহাবাদের) সংশ্রবে থেকেছি, যারা নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সোনা-রূপার চাইতেও মূল্যবান মনে করতেন।’ অথচ অনেক মানুষ সময়ের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন।ইবনুল জাওজি রহ: লিখেন- ‘মনে রাখবেন, সময় খুবই দামি। একটি মুহূর্তও নষ্ট করার নয়! মানুষ সময় নষ্ট করে, অথচ এই সময়ে সে বেহিসাব নেকি কামাই করে নিতে পারত। সময় হলো আবাদি জমির মতো। যদি আমরা একটি বীজ বপন করি তবে হাজারটা শস্য পাবো। এরকম পরিস্থিতিতে কোনো জ্ঞানী মানুষ কি বীজ বপন করা থেকে বিরত থাকতে পারে?’

সময়কে কাজে লাগালেই ধরা দেয় সফলতা। প্রকৃতপক্ষে যারা সফল, তাদের ভিন্ন কোনো গুণ নেই! তাদের গুণ এটাই যে, তারা সময়কে কাজে লাগায়।

সিদ্ধ তাবেঈ আমর ইবনে কায়েস রহ:-কে জনৈক ব্যক্তি বলল, হজরত আসুন একটু কথা বলি। তিনি উত্তরে বলেন, 'সূর্যের যাত্রা থামিয়ে দাও, তোমার সাথে কথা বলব! ' সময় কতই না মূল্যবান ছিল তাদের কাছে।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহ:- বলেন, 'আল্লাহর কসম! খানাপিনার সময়টুকুকে কাজে লাগাতে না পারায় আমার ভীষণ আফসোস হয়! কেননা সময় অতি মূল্যবান।' অথচ আমরা কোথায়?

সময়কে মূল্যায়ন করে যারা বড় হয়েছেন, তাদের অন্যতম ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িতকালেও একটি মাসআলা নিয়ে চিন্তারত ছিলেন। হজরত মারুফ কারখি (রহ.)-এর দরবারে একবার কিছু লোকজন এসে দীর্ঘক্ষণ বিলম্ব করল। বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, 'সূর্য চালনাকারী ফেরেশতা কখনও ক্লান্ত হন না। অতএব, বল দেখি তোমরা কখন উঠবে?' হাদিসশাস্ত্রের ইমাম বোখারি (রহ.) ধরাপৃষ্ঠে আগমন করে যখন চোখ খুললেন, তখন সর্বত্র ইসলামি জ্ঞানের চর্চা চলছিল। নবীজি (সা.)-এর যমানা মাত্র শেষ হলো। সাহাবায়ে কেরামের সংশ্রবে লালিত মহাপুরুষগণ তখনও জীবিত ছিলেন। জ্ঞানের পিপাসা নিয়ে সফরের লাঠি হাতে ধারণ করে রওনা হলেন তৎকালীন মুহাদ্দিসগণের কাছে বিভিন্ন শহরে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হিসাব করে করে কাজে লাগিয়েছেন। কখনও কারও গিবত করেননি। তিনি বলেন, 'স্মৃতিশক্তি বর্ধনের একমাত্র মাধ্যম হলো অটল, অবিচল ও একাগ্রতার সঙ্গে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা।' তিনি এক লাখ সহিহ হাদীস ও দুই লাখ গাইরে সহিহ হাদিস মুখস্থ করেছেন। এ ছাড়া হজরত দাউদ তাঈ (রহ.) রুটির পরিবর্তে ছাতু খেতেন। কারণ জিজ্ঞেস করা হলে বলতেন, 'রুটির বদলে ছাতু খেলে ৫০টি আয়াত বেশি তেলাওয়াত করা যায়।' বিখ্যাত আরবি ব্যাকরণবিদ খলিল ইবনে আহমদ (রহ.) বলতেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে অসহ্যকর লাগে খাওয়া-দাওয়ার সময়টুকু।'

ইসলাম মানুষের সার্বিক কল্যাণ, চিন্তা ও পরকালীন সুখ-সমৃদ্ধির বিষয় সামনে রেখে মানুষকে সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন, এর সদ্ব্যবহার ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনার নির্দেশ প্রদান করে। সময় হচ্ছে এই সংক্ষিপ্ত দুনিয়াতে মানুষের প্রধান সম্পদ। এটা তার আয়ূষ্কালের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং তার কাঁধে একটা বড় দায়িত্ব। যদি সে সময়ের দ্বারা উপকৃত হয়, তাহলে সে তার উত্তম প্রতিফল পেল। আর যদি সে তার কাঁধে সময় নামক অর্পিত বস্তুর আমানত ও দায়িত্ব পালনে খেয়ানত করে, তাহলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিছু চমৎকার কাহিনি

যারা সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছে এবং প্রতিটি মুহূর্তের মূল্য দিয়েছে, এমন বীরেরা যদি আমাদের সামনে নাও থাকে অথবা যদি মারাও যায়, তবুও তাদের মাঝে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। হাসান বসরি এই ধরনের ব্যক্তিদের প্রশংসা এভাবে করতেন যে, 'আমি এমন কিছু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে পেয়েছি, যারা তাদের অর্থের চেয়ে জীবনের ব্যাপারে বেশি কার্পণ্য করতেন।'

একদা হজরত ইবনে ওমর (রাঃ) যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একটি কবর তার দৃষ্টি গোচর হল। তিনি সেখানে যাত্রা বিরতি করে সওয়ারী থেকে অবতরণ করে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। তার সঙ্গীরা ভাবলেন, এখানে হয়তো কোনো বিশেষ ব্যক্তির কবর হবে। তাই তারাও সওয়ারী থেকে নেমে হজরত ইবনে ওমরের (রাঃ) অনুকরণে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে সবাই পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। ভ্রমণের এক পর্যায়ে সঙ্গীদের একজন অদম্য কৌতূহল নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কেনো? এর রহস্য কি? তিনি বললেন, ব্যাপার হল আমি যখন ঐ কবরের পাশ দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলাম তখন আমার হৃদয়ে ভাবনার উদ্রেক হল যে, যারা দুনিয়া ত্যাগ করে কবর জগতে অবস্থান করছে তাদের আমল বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তারা শত চেষ্টা করলেও আমল করতে পারবে না, আর কেউ আল্লাহর বিশেষ কৃপায় কোন করলেও তার কোন সাওয়াব লেখা হবে না। হাদীস শরীফে এসেছে, এই লোকগুলো (কবর বাসীরা) কবরে থেকে এই আকাংখা করতে

থাকবে যে, হায়! যদি আমরা আরো এতটুকু সময় পেতাম যাতে আরো দু ‘ রাকাত নফল নামায পড়া যায়; তাহলে আমাদের নেক আমলের দপ্তরে আরো দু ‘ রাকাত নামাযের সাওয়াব যোগ হয়ে যেত। কিন্তু তাদের এই আকাংখা ও অনুতাপ সত্ত্বেও নামায পড়ার সুযোগ তাদের আর আসবে না। তাই আমি ভাবলাম, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে সুযোগ দান করেছেন সে সুযোগ কাজে লাগিয়ে দু ‘ রাকাত নামায পড়ে নেই।
আল্লাহ্ তাআলা যাদেরকে এ চিন্তা - চেতনা দান করেছেন তাদের জীবনটাই বিচিত্রময়। তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এভাবেই কাজে লাগিয়ে থাকেন।

আল্লামা হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস। আমলের যে উচ্চ শিখরে আল্লাহ তাআলা তাকে অধিষ্ঠিত করেছেন আজকের মানুষ তার কল্পনাও করতে পারে না। তার দীপ্ত জীবনী সাক্ষ্য, তিনি একজন খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। লেখতে লেখতে যখন কলমের নিব নষ্ট হয়ে যেত (বাঁশের কলম) তখন তিনি নিজেই চাকু দিয়ে নিব তৈরী করতেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে, নিব তৈরীর এ সামান্য সময়টুকুও তিনি আল্লাহর এবাদতশূণ্য ছেড়ে দিতেন না। নিব তৈরীর পাশাপাশি তিনি আল্লাহর যিকির করতেন,(سبحان الله ، الحمد لله ، الله اكبر) এর যিকির সামান্য সময়ের জন্য ও তার জবান থেকে দূরে থাকতো না। তিনি ভাবতেন, যে সময়টুকু তাসনিফের কাজে ব্যায় হচ্ছে তা তো নির্ঘাত আল্লাহর এবাদতেই ব্যায়িত হচ্ছে। কিন্তু যে সামান্য সময় নিব মেরামতে যাবে তো কেন এবাদতহীন অতিক্রান্ত হবে? তাই এটুকু সময়কেও তিনি কাজে লাগাতেন। এ হল পূর্ববর্তী ইমাম ও আলেমদের চিন্তা ও চেতনা, তাঁদের ভাব ও ভাবনা এবং সময়ের ব্যাপারে তাঁদের মূল্য ও মূল্যায়নের কতক খণ্ডচিত্র। বরং বলা ভাল, তাদের বহুজন থেকে অল্প ক'জনের জীবনের সামান্য অংশের উপর একটি ত্বরিত দৃষ্টি মাত্র। সবার কৃতিত্ব ও গুণাবলীর উল্লেখ করা হলে তো এটি শত খণ্ডের বিশাল গ্রন্থে পরিণত হবে এবং এর রচনায় একাধিক জীবনকালের প্রয়োজন হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তো ছিলেন ইসলামের গৌরব, বরং সমগ্র মানবজাতি ও মানবতার গৌরব।

দুনিয়ার কাজে সময় ব্যয়

রাসূল (সঃ) ইরশাদ করেন-

اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل للاخرة بقدر بقائك فيها

অর্থ, দুনিয়ার জন্য সে পরিমাণ মেহনত কর যে পরিমাণ সময় তোমাকে এখানে থাকতে হবে। আর আখেরাতের জন্য সে পরিমাণ চেষ্টা এবং সময় ব্যয় কর যে পরিমাণ সময় তোমাকে সেখানে থাকতে হবে।

আখেরাতে আমাদেরকে থাকতে হবে সদাসর্বদা এবং অনাদি-অনন্ত কাল। তাই তার জন্য মেহনতও করতে হবে সীমাহীন। আর দুনিয়াতে আমরা থাকবো অনুর্ধ্ব ৬০-৭০ বছর। আর এরও কোন গ্যারান্টি নেই। তাই এর জন্য সামান্যতম মেহনতই যথেষ্ট। এটাই প্রিয় নবীর (সঃ) শিক্ষা। অথচ আজ আমরা চব্বিশটি ঘন্টাই শুধু দুনিয়া-দুনিয়া করে মরছি। কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা সময় ব্যয় করতেও আমাদের শত আপত্তি, বাধা, দ্বিধা ও নানা বাহানা।সারা দিন শুধু মসজিদে বা খানকায় বসে থাকার নাম আখেরাতের কাজ করা নয়। দুনিয়াতে মানুষের শত জরুরত আছে। যদি এ জরুরতগুলোকে সাওয়াবের নিয়তে আদায় করা হয় তাহলে এক দিকে যেমন পার্থিব চাহিদা পূরণ হবে তেমনি অপর দিকে পরকালের সঞ্চয়ও হয়ে যাবে। ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় যদি নিয়ত করে যে, আল্লাহর রাসূল ও জীবিকার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তাই আমিও করছি। এভাবে প্রতিটি কাজই যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে রাসূলের সুন্নাত তরিকা অনুযায়ী হয় তাহলে সবই ইবাদতে পরিণত হবে এবং এর জন্য সাওয়াবও পাওয়া যাবে।এছাড়া মানুষের সাধারণত হাতে বা পায়ে কাজ থাকে। মুখ প্রায় সকলেরই অবসর থাকে। বসা, কাজ করার ফাঁকে মুখে বেশ আল্লাহর যিকির করা যায়। ফলে বিশুদ্ধ নিয়তের সাওয়াব, সুন্নাত তরিকায় কাজ করার সাওয়াব এবং মুখে যিকির করার সাওয়াব সব মিলিয়ে দেখা যাবে আখেরাতের বিরাট পুঁজি হয়ে গেছে। আর এ ভাবেই আল্লাহ তায়ালা এ উম্মতকে জান্নাত দান করবেন।

এক বণিকের ঘটনা

ঘটনাটি কিছুটা হাস্যকর। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যদি অনুধাবন করার মন ও ক্ষমতা দেন তবে এটি উপদেশ মূলকও। আমাদের এক বুযুর্গ ঘটনাটি শুনিয়েছেন- এক আঁতর ব্যবসায়ী। সে ঔষধও বিক্রি করত। তার এক ছেলে তাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করত। প্রয়োজনে দোকানেও বসত। একবার সে বাহিরে কোথাও যাওয়ার সময় ছেলেকে সব জিনিষের দাম বুঝিয়ে দিল। ছেলে দোকানে বসল। এদিকে একজন গ্রাহক এসে দু'বোতল শরবত ক্রয় করতে চাইল। ছেলেটি একশ' করে দু'বোতল শরবত বিক্রি করল। ইতোমধ্যে তার পিতা ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল- কি কি বিক্রি করেছ। ছেলে বলল, অমুক জিনিষ দু'বোতল দু'শ' টাকায় বিক্রি করেছি। একথা শুনে পিতা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ছেলেকে বলল, তুমি আমাকে শেষ করে দিয়েছ। এর প্রতিটি বোতল এক হাজার টাকা করে। আর তুমি মাত্র একশ' টাকায় বিক্রি করেছ। পিতার এ ধরণের অনুতাপ ও আফসোস ছেলেকে দারুন ভাবিয়ে তুলল। ছেলে পেরেশান হয়ে পড়ল। ছেলের এই পেরেশানী দেখে পিতা সান্ত্বনার স্বরে বলল, আরে! পেরেশান হওয়ার কারণ নেই। তুমি যে বোতল একশ' টাকায় বিক্রি করেছ তাতে আটানব্বই টাকাই লাভ হয়েছে। বাকী, একটু সতর্ক হলে দু'হাজার টাকা হত। ক্ষতি হলে এটাই হয়েছে।

ধন-সম্পদ থেকেও সময় অতি মূল্যবান। সময় তার নিজ গতিতে চলতে থাকে, সব কিছু শুরু হয়, আবার শেষ হয়, রাত যায় দিন আসে, দিন যায় রাত আসে, শেষ হয়ে যায় সপ্তাহ, পক্ষ, মাস ও বছর। এভাবেই চলতে থাকে আমাদের জীবন প্রহর। সময়ই মানুষের জীবন, আরবিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে, সময়ের নামই তো জীবন, তাকে নষ্ট কর না। সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা যেমন ব্যক্তি সফলতার উচ্চ মাকামে পৌঁছে। অপরদিকে এর অবহেলার দ্বারা সে নিক্ষিপ্ত হয় ব্যর্থতার অতল গহ্বরে। সময়কে যারা মূল্যায়ন করে, তারাই সফলকাম হয়, তাদের ভবিষ্যৎ হয় উজ্জ্বল, আর যারা সময়ের মূল্য সম্পর্কে বুঝে না, তাদের জীবনের সফলতা আসে না। আসে শুধু ব্যর্থতা আর পদস্খলনতা। আল্লাহ

আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন স্বল্প হায়াত দিয়ে, দুনিয়াতে আমাদের সময় খুব কম, কিন্তু মানবজীবনে পালনীয় কর্তব্য অনেক বেশি, অল্প সময়ে অপরিসীম কাজ আঞ্জাম দেওয়ার হেকমত হলো, সময়ের হেফাজত করা, সীমিত হায়াতে সময় নষ্ট না করে, অপরিসীম দায়িত্ব যে পালন করা সম্ভব, তার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন আমাদের পূর্বসূরিরা, তাদের জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উনারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সময়কে গুরুত্ব দিয়েছেন, সময়কে কাজে লাগানোর মাঝেই তারা নিমজ্জিত ছিলেন।

ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, দুনিয়ার কাজে যে ভাবে মানুষ সম্ভাব্য লাভ না হওয়াকে ক্ষতি বলে মনে করে দ্বীনের ব্যাপারেও এ ধরণের চিন্তা করা উচিৎ। যদি জীবনের কোন মুহুর্ত এমন কাজে ব্যয়িত হয় যাতে কোন উপকারীতা নেই, তাহলে নিশ্চয় তা ক্ষতিরই শামিল। কারণ যদি তুমি সচেষ্ট হতে তাহলে এ সময়ে আখেরাতের অনেক বড় উপকার করে নিতে পারতে তাই খুব চিন্তা ভাবনা করে জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত সঠিক কাজে ব্যয় কর।

কাজ তিন প্রকার

হযরত ইমাম গাজালী (রঃ) বলেন, দুনিয়াতে যত কাজই হচ্ছে বা মানুষ যত কাজই করছে তা তিন ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত: কাজটা হবে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক। চাই সে কল্যাণ দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী।

দ্বিতীয়ত: কাজটা হবে ক্ষতিকর বা ধ্বংসাত্মক। সে ক্ষতি চাই দ্বীনি হোক আর দুনিয়াবী।

তৃতীয়ত: কাজটা এক দিকে যেমন মঙ্গল ও কল্যাণহীন অন্য দিকে তেমনি তাতে কোন ক্ষতিকর দিকও নেই। না পার্থিব না পারত্রিক।

উক্ত তিন প্রকারের তৃতীয় প্রকার হল অহেতুক কাজ। তাই এটি বর্জনীয়। এছাড়াও দ্বিতীয় প্রকার তো দ্বিধাহীন চিত্তেই ছেড়ে দেয়া অত্যাবশ্যক। কারণ তা ক্ষতিকর। উপরন্তু যদি গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে তৃতীয় প্রকারও (যাতে উপকার বা ক্ষতি কোনটিই নেই) ক্ষতিকর হিসেবেই বিবেচিত হবে। কারণ, যখন মানুষ এ ধরণের কাজেলিপ্ত হয়ে নিজের মূল্যবান সময় ব্যয় করতে শুরু করে তখন 'সময় নষ্ট' হওয়ার বিচারে প্রকারান্তরে

এটাও ক্ষতিরই শামিল। সুতরাং তৃতীয় প্রকারের কাজে লিপ্ত হয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করা আদৌ সঙ্গত হবেনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, এক ব্যক্তি একটি দ্বীপে প্রবেশ করল। যেখানে স্বর্ণের একটি স্তূপ রয়েছে। স্তূপের মালিক প্রবেশকারী কে বলল, এখানে তোমার যতক্ষণ থাকার অনুমতি রয়েছে ততক্ষণ তোমার যাচ্ছে স্বর্ণ নিতে পার। কিন্তু জেনে রেখো, আমি হঠাৎ যে কোন মুহুর্তে তোমার এখানকার অবস্থানাধিকার বাতিল করে দেব। আর এ-ও জেনো যে, বাতিলের পর তুমি আর এক বিন্দু স্বর্ণও উঠাতে পারবে না। আর আমি কখন তোমার অধিষ্ঠান বাতিল করব তাও তোমাকে জানাচ্ছিনা, এবং বাতিলের পর তোমাকে দ্বীপ থেকে জোর পূর্বক বের করে দেয়া হবে। একটু ভেবে দেখুন, উক্ত পরিস্থিতিতে প্রবেশকারী ব্যক্তি কি একটি মুহূর্তও অযথা বিনষ্ট করবে? সে কি এটা ভাববে যে, এখনও হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে, একটু বিশ্রাম করে নেই, পরে স্বর্ণ সংগ্রহ করবো? নিশ্চয়ই নয়। বরং সে সর্বক্ষণ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে, কি ভাবে কত বেশী নেয়া যায়। কারণ, সে যা কুড়িয়ে নিবে তাই তার। এখানে অন্য কেউ অংশীদার হবে না। ঠিক এভাবেই আমাদের কেও স্বল্প পরিসরের এ মূল্যবান সময়ে নেকী অর্জনে ব্রতী হতে হবে।

দায়িত্ব অনেক বেশি

এতে সন্দেহ নেই যে, একজন মানুষের ওপর অনেকগুলো দায়িত্ব থাকে নিজের, বাবা-মার, স্ত্রীর, সন্তানসন্ততির, পাড়া-প্রতিবেশীর, চাকর-চাকরানির। দিনের অধিকাংশ সময় তাকে এসব দায়িত্ব পালনের মাঝে ডুবে থাকতে হয়। আবার যখন এই সময়ের সাথে তার দৈনন্দিনের জীবিকা অন্বেষণের জন্য ব্যয়িত দীর্ঘ সময়কে যুক্ত করা হবে, তখন সময় আরও সংকীর্ণ হয়ে যাবে। জীবিকার জন্যই সময় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। এ জন্যই সময়ের মূল্য অনেক বেশি।

একদা কিছু লোক উমর বিন আব্দুল আজিজ-এর নিকট এল। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব ও উম্মাহর চিন্তা তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল। তারা তার নিকট এসে বলল, 'নিজের বোঝাটা কিছুটা হালকা করে নিন।' তিনি তাদের বললেন, 'তাহলে আমার আজকের দিনের

কাজগুলো কে করে দেবে?' তারা বলল, 'আগামীকাল সেগুলো আপনি করে নেবেন।' তিনি বললেন, 'একদিনের কাজ আদায় করতে করতেই আমি দুর্বল হয়ে পড়ছি। তাহলে দুদিনের কাজ একত্রিত হলে আমার কী অবস্থা হবে?!'

প্রকৃত জীবন হল যৌবনকাল

প্রকৃত জীবন ও কর্মময় জীবন তো হল জীবনের মধ্যভাগ অর্থাৎ যৌবন কাল। কেননা এই কালটিই অর্জন ও কর্মের বিস্তৃত ময়দান, দান ও উদ্ভাবনের বিশাল ক্ষেত্র। এসময় শক্তি থাকে পরিপূর্ণ, মনোবল থাকে সুউচ্চ। আর অসুস্থতা, দুর্বলতা বা কোন প্রতিবন্ধকতা! তা তো এ বয়সের ধর্ম নয়।যৌবনকালের ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে রয়েছে অনেক মূল্যবান কথা ও উপদেশ। বিজ্ঞজনরা বলেন থাকেন-

‘পাকা দাড়ির বুড়ো লোকের ফরজ, নফল, তাহাজ্জুদ নামাজে যে সওয়াব রয়েছে, একজন যুবক শুধু ফরজ নামাজ পড়লে তার চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে।’

সে কারণেই নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন- ‘একজন বৃদ্ধের ইবাদতের চেয়ে আল্লাহ তাআলা সেসব যুবকের ইবাদতে বেশি খুশি হন; যারা যৌবন বয়সে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকে।’

যৌবনকাল আল্লাহর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে এ বয়সের ইবাদত-বন্দেগিতেও রয়েছে বিশেষ সুসংবাদ। হাদিসে এসেছে- ‘আর যে যুবক তার যৌবনকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দেয়; রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছেন, কেয়ামতের দিন; যেদিন আল্লাহর (আরশের) ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না; আল্লাহ তাআলা তাকে (আরশের) স্বীয় ছায়ার তলে আশ্রয় দেবেন।’

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিসে যৌবনের গুরুত্ব ওঠে এসেছে। হাদিসে তিনি জানান, আল্লাহ কেয়ামতের দিন প্রত্যেক মানুষকে তার যৌবন কালের কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। যৌবনের হিসাব নেবেন। এ হিসাব দেওয়ার আগ পর্যন্ত কোনো আদম সন্তানকে এক কদমও নড়তে দেওয়া হবে না।আল্লাহর কাছে যৌবনকাল অনেক

বেশি প্রিয়। সে কারণেই তিনি সব নবি-রাসুলকেই যৌবনের টগবগে বয়সে সত্য দ্বীনসহ দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত করেছেন। হাদিসে পাকে এসেছে-

হজরত আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা একমাত্র যুবক বান্দাকে জ্ঞান দান করেন। যাবতীয় কল্যাণ যৌবনেই লাভ করা সম্ভব হয়।প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবু উছমান জাহিয যখন বার্ধক্য ও তার উপসর্গসমূহে আক্রান্ত হলেন তখন দুর্বলতা, আর রোগ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন,

أَتَرْجُو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب
لقد كذبتك نفسك ليس ثوب دريس كالجديد من الثياب

অর্থ : তুমি কি আশা করছ, বার্ধক্যে যৌবনের শক্তি ও উদ্যম লাভ করবে? মন তোমায় মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছে। জীর্ণ কাপড় তো নতুন কাপড়ের মত নয়? বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ এবং সফল ও ভাগ্যবান তো সেই, যে তার বিদ্যমান প্রতিটি সেকেন্ডকে, বর্তমান প্রতিটি মুহূর্তকে বিভিন্ন উপকারী ও ফলদায়ক কর্ম ও কীর্তি দিয়ে পূর্ণ করে রাখে।

যৌবন সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)- এর উক্তি

এ জীবনের একদিন অবসান ঘটবেই। জীবন যে কত গতিময় তা বুঝা বড় দায়। যা চলে যায় তা আর কখনও ফিরে আসে না। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, আমি আমার যৌবন কালকে ঐ বস্তুর মত মনে করি যা কাপড়ের আঁচলে ছিল; পরে হঠাৎ কোথায় যেন পড়ে গেল। যৌবন যদিও দীর্ঘ মনে হয় বাস্তবে তা খুবই সামান্য। এ ভাবে জীবন বহু লম্বা মনে হয়, আসলে এর পরিধি একেবারেই ছোট।

ছাত্রদের অলস মানসিকতা

আফসোস ও পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগে ছাত্রদের মাঝে মানসিক দুর্বলতা ও আলস্য মনষ্কতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা আরাম- আয়েশ কে সাধনা ও পরিশ্রমের উপর প্রাধান্য দিতে শুরু করেছে। গল্পগুজব, বিলাসিতা ও অন্যান্য অনর্থক কাজকর্মকে জীবনের লক্ষ্য মনে করছে। ভোগ বিলাসকে প্রকৃত উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে। যার ফল হচ্ছে এই, অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জনে ব্যয় করার মত সময় তাদের হচ্ছে না। এমনকি এর মানসিকতাও তাদের মাঝে বাকী থাকছে না।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানোর পদ্ধতি

* যথাসাধ্য নির্জনতা অবলম্বন করা।

* মেহমান বা সাক্ষাৎকারীদের সাথে যথা সম্ভব আলোচনা সংক্ষিপ্ত করা।

* চব্বিশ ঘন্টার রুটিন বানিয়ে সে অনুপাতে কাজ করা।

* পরিমিত আহার করা।

* নিদ্রা কমিয়ে দেয়া।

* অহেতুক কাজ পরিহার করা।

* সব কাজের ঝামেলা নিজ কাঁধে না নিয়ে কিছু কিছু কাজ যোগ্য লোক বিশেষে বন্টন করে দেয়া।

এভাবে নিয়মানুযায়ী সময় অতিবাহিত করলে জীবনের একটি মুহূর্তও নষ্ট হবে না। প্রতিটি মুহূর্ত দ্বীনের কাজে ব্যয় হবে। যদি দ্বীনের কাজে ব্যয় নাও হয় তাহলে অন্ততঃ দুনিয়ার কাজ হলেও হবে। কিন্তু বেকার নষ্ট হবেনা।

অলসতা ও ঘুম দূর করার পদ্ধতি

ছাত্রদের উচিৎ পড়ার সময় অলসতা ও ঘুম অসলে তা প্রতিহত করা। খাহেশকে প্রশ্রয় দেয়া উচিৎ নয়। পড়ার সময় অলসতা বা তন্দ্রা আসলে তার চিকিৎসা করতে হবে। আর এর অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে। যেমনঃ

* ছাদ বা উন্মুক্ত বাতাসে বের হওয়া।

* এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যাওয়া।

* ঠান্ডা বা গরম পানি দ্বারা হালকা গোসল করা।

* কোন সুস্বাদু পানীয় গ্রহণ বা হালকা নাস্তা করা।

* সহপাঠীর সাথে কিছুক্ষণ আলাপ-আলাচনা করা।

* কবিতা পাঠ করা।

* উচ্চ আওয়াজে কুরআন তিলাওয়াত করা।

* বসার ধরণ পরিবর্তন করা।

* কিছুক্ষণ চলা-ফেরা করা।

* উপরে উঠা (বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি বেয়ে)।

* কিতাব বা পুস্তক পরিবর্তন করা।

অলসতা ও তন্দ্রা দূরী করণে উল্লেখিত বিষয়গুলো ছাড়াও নিজ নিজ পরিমন্ডলে আরও বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

সাফল্য অর্জনকারী তালেবে ইল্মের গুণাবলী

সময়কে সঠিক ভাবে হিফাযত করা ও সসয় দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য তালেবে ইলমের তিনটি গুণ থাকা প্রয়োজন।

১। দ্রুত লিখতে পারা।

১. দ্রুত পাঠ করতে পারা।

৩. দ্রুত গতিতে চলা।

দ্রুত লিখন: এতে উস্তাদের পুরো তাক্রীর বা লেকচার খাতাবন্ধী করা সম্ভব।

দ্রুত পঠন: এর দ্বারা দ্রুত মুখস্থ করে অন্য কাজ করা যায় এবং বেশী ইলম অর্জন করা যায়।

দ্রুত চলন: দ্রুত চলার উপকারিতা হল, সে অল্প সময়ে বিভিন্ন শায়েখের কাছে যেতে পারবে এবং তাঁদের দরবারে হাজির হতে পারবে। নিঃসন্দেহে এই গুণগুলো একজন তালিবে ইলমকে অল্প সময়ে অধিক 'পাথেয়' অর্জনে সহযোগিতা করবে।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ বলেন, আমি তার সাথে চতুর্থ একটি গুণ যোগ করতে চাই। আর তা হল, পানাহারে দ্রুততা। কেননা যদি সে দ্রুত খাবার গ্রহণ না করে, বরং তাতে প্রবল আসক্তি রাখে এবং দীর্ঘ সময় ব্যয় করে, তবে দ্রুত পড়ে, লিখে ও চলে যে সময় সে সঞ্চয় করবে তার সব বা অধিকাংশই তো খাবার আয়োজন ও তা গ্রহণেই চলে যাবে। তখন পূর্বের নসীহতের উপর আমলও তার জন্য তেমন ফলপ্রসূ হবে না। ইমাম নববী র. তাঁর সুবিশাল গ্রন্থ المجموع এর ভূমিকায় লিখেন, “প্রত্যেক তালেবে ইলমকে প্রতি মহূর্তে ইলমের প্রতি আগ্রহী ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। দিন ও রাতে, আবাসে ও প্রবাসে ইলমের অর্জন বা তার ভাবনা ছাড়া একটি মুহূর্তও যেন অতিবাহিত না হয়- শুধু পানাহার, ঘুম ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত। আর তাও হতে হবে নিতান্তই প্রয়োজনীয় মুহূর্তে, প্রয়োজন পরিমাণে এবং পরিমিত সময়ে।

কাযী ইয়ায র. তাঁর الشفاء بتعريف حقوق المصطفى গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ করেন, পূর্ববর্তী আরবগণ এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ খাবার ও ঘুমের স্বল্পতা নিয়ে পরস্পর গর্ব ও বড়াই করতেন। আর সে দু'টির আধিক্যকে নিন্দা ও ঘৃণা করতেন। কেননা পানাহারের আধিক্য অতিলোভ ও লালসার প্রমাণ বহন করে এবং মন-মানসিকতায় স্থবিরতা ও দেহে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে পরিমিত আহার অল্পেতুষ্টি ও আত্মসংযম প্রমাণ করে এবং তা দেহে সুস্থতা, চিন্তা- ভাবনায় স্বচ্ছতা ও মেধায় প্রখরতা দান করে।

তেমনিভাবে ঘুমের আধিক্যও দুর্বলতা, নির্জীবতা, নির্দয়তা, উদাসীনতা এবং বিভিন্ন রোগ ব্যাধির কারণ। আর জীবন ও সময় তো কর্মহীনতায় নষ্ট হয়ই। এ দু'টোর মাঝে একটি মিলও রয়েছে যে, অধিক ঘুম, বেশী খাওয়া-দাওয়া থেকেই হয়ে থাকে।

লোকমান হাকীমের হিকমতপূর্ণ কথার একটি এটিও যে,

يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة

অর্থঃ হে বৎস, যখন উদর পূর্ণ হবে তখন চিন্তা-ভাবনা নির্বাপিত হয়ে যাবে। হিকমত বিদায় নেবে এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইবাদত-বন্দেগীতে অক্ষম হয়ে পড়বে।

সুফিয়ান ছাওরী র. বলেন-

بقلة الطعام يملك سهر الليل

"পানাহারের স্বল্পতা দ্বারাই রাতজাগা সম্ভব" বা "রাত জাগতে চাও, তবে খাবার/পানাহার কমিয়ে দাও।”

ছাহনূন র. বলেন,

لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع

"ইলম অর্জন তার কাজ নয়, যে উদরপূর্ণ করে আহার করতে থাকে।

উমর রা. বলেন, "উদরপূর্ণ আহার ও অতিভোজন থেকে তোমরা বিরত থাক। কেননা, তা অলসতা আনয়ন করে, রোগ-ব্যাধির সৃষ্টি করে, দেহ-কাঠামো ও মন- মানসিকতা বিগড়ে দেয়। বরং আহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, এতে তুমি অপচয় থেকে বাঁচবে, তোমার দেহ-মন সুস্থ থাকবে, কাজে-কর্মে ও ইবাদত-বন্দেগীতে উদ্যম ও সতেজতা আসবে। আর জেনে রাখ, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত বরবাদ ও ধ্বংস হয় না, যতক্ষণ না সে ধার্মিকতা, দ্বীনদারী ও আবদিয়্যাতের উপর কামনা- বাসনাকে প্রাধান্য দেয়।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) মাত্র ৫৭ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তিনি প্রায় পাঁচ শ গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাতেন। পড়া বা লেখা বা ইবাদত ছাড়া কোনো মুহূর্ত ব্যয় কাটাতেন না। আল্লামা আবদুল হাই লখনৌবি (রহ.) মাত্র ৩৯ বছর বেঁচেছিলেন। এ সময়ে তিনি ১১০টির বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে অনেক গ্রন্থ কয়েক খণ্ডের রয়েছে। হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলি থানবি (রহ.) ৮১ বছর বেঁচেছিলেন।

এ সময়ে হাজারের বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত কঠোর সময়ানুবর্তিতার কারণে তাঁদের পক্ষে এত বেশি লেখা সম্ভব হয়েছে।

আল্লামা আব্বাস বিন আলভী (রঃ) বলেন, তোমাদের জ্ঞানশক্তি সব ধরণের ইল্ম অর্জনে সক্ষম। তাই এই ধারণ ক্ষমতাকে তোমরা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইল্ম অর্জনে ব্যবহার কর। তোমাদের ধন-সম্পদ সব ধরণের মানুষ কে ধনী বানাতে সক্ষম নয়; তাই যারা পাওয়ার যোগ্য তাদের মাঝেই তা বন্টন কর। তোমাদের পক্ষে দুনিয়ার সব মানুষকে সম্মান দেয়া সম্ভব হবে না; তাই যারা সম্মান পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই সম্মান কর। দিন-রাতে সব প্রয়োজনীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়; তাই কাজ নির্বাচন করে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে প্রাধান্য দাও। যদি তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-চিন্তা-চেতনাকে গুরুত্বহীন কাজে ব্যয় কর তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। এমনি ভাবে যখন তোমরা নিজেদর ধন-সম্পদ অবৈধ পথে ব্যয় করবে, তখন সৎ পথে দান করতে পারবে না। যদি অযোগ্য লোকদের সম্মান দেয়ার পেছনে পড় তাহলে যোগ্য ও কামেল লোকদেরকে যথার্থ সম্মান দিতে পারবে না। যদি দিন-রাতকে অপ্রয়োজনীয় কাজে কাটিয়ে দাও তাহলে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য তোমাদের হাতে কোন সময় থাকবে না।

আজ যদি আমরা শুনি যে, অমুক আলেম বা অমুক রাইটার শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাহলে আমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ি যে, এ কি করে সম্ভব! হ্যাঁ, যারা সময়ের যথার্থ মূল্যায়ন করে তাদের পক্ষে এটা কোন ব্যাপারই না। বরং এর চেয়ে বড় কিছু হলেও তা তাদের পক্ষে সম্ভব।

'ইমাম মুআফফিক বিন কুদামাহর উপদেশ'

ইমাম মুয়াফফিক বিন কুদামাহর অসিয়ত :

তোমার মূল্যবান জীবনকে গনিমত মনে করো, গুরুত্বপূর্ণ সময়গুলোর প্রতি যত্নবান হও। মনে রেখো, জীবনটা একটি নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে আবদ্ধ, নিশ্বাসের সংখ্যা নির্ধারিত। তাই একেকটি নিশ্বাস ত্যাগের মাধ্যমে তোমার জীবন থেকে একটু একটু করে সময় ক্ষয়ে

পড়ছে। জীবনটা খুবই ছোট। মাত্র কয়েকটি দিন মাত্র। এর প্রতিটি অংশ হীরা-জহরতের চেয়েও মূল্যবান। যার কোনো তুলনা এবং স্থলাভিষিক্ত হয় না। অল্প কিছু দিনের এই ক্ষুদ্র জীবনটা অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ চিরস্থায়ী শান্তিতে থাকবে আবার কেউ চিরস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। যখন তুমি এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে চিরস্থায়ী ভাবতে থাকবে, তখন তোমার কাছে একেকটি নিশ্বাস জান্নাতের হাজার হাজার বছরের সমান মনে হবে। যা অনুমান করা অসম্ভব। আর যদি কারও অবস্থা এমনই হয়, তাহলে এর কোনো মূল্যই নেই। অতএব, মুক্তাতুল্য জীবনের সময়গুলোকে কর্মহীন নষ্ট করে দিয়ো না। কোনো মূল্য ছাড়া সময়গুলো অতিবাহিত করো না। সর্বদা চেষ্টা করো, যেন তোমার একটি নিশ্বাসও আল্লাহর আনুগত্যের বাইরে ব্যয় না হয়। কারণ, তোমার কাছে যদি দুনিয়ার কোনো মণিমুক্তা থাকে, তাহলে তা নষ্ট করা তোমার জন্য শোভা পাবে না। সুতরাং কীভাবে তুমি হীরার চেয়েও মূল্যবান নিজের জীবনটা অবহেলায় নষ্ট করে দেবে?! অনর্থক নষ্ট হয়ে যাওয়া অতীতের জন্য কেনই-বা দুঃখ হবে না?

ভবিষ্যতের আশায় ধোঁকা খেয়ো না

অনেকে ধারণা করে, আগামীতে হয়ত অবসর সময় পাওয়া যাবে, ভবিষ্যতে হয়ত ব্যস্ততা ও ঝামেলা থেকে সে মুক্ত হবে, তখন সে যুবাবয়সের তুলনায় অনেক বেশী অবকাশ পাবে। কিন্তু বাস্তবতা হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

মুহাদ্দিস আবু মুহাম্মদ জাফর বিন মুহাম্মাদ আব্বাসী (রহ) এমন ব্যক্তি যিনি ঐ বয়সে পৌঁছেছেন এবং তখনকার পরিস্থিতি ও বাস্তবতা উপলব্ধি করেছেন। তিনি বলেন- "তোমার বয়স যতই বাড়বে ততই তোমার দায়িত্ব বাড়তে থাকবে। বিষয় ও ব্যক্তি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এভাবে, তোমার সময় কমে আসবে, শক্তি হ্রাস পেতে থাকবে।

বার্ধক্যের সময় তো আরও সংকীর্ণ হয়ে যায়। দেহ আরও দুর্বল হয়ে যায় এবং সুস্থতার সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ হয়ে যায়। উদ্যম হ্রাস পায়, কিংবা প্রায় হারিয়েই যায়। অথচ দায়িত্ব ও ব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়, কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং তুমি তোমার এই সময়টাকেই (অর্থাৎ) যুবা বয়সটাকেই কাজে লাগাও। এটাই সুযোগ। অনাগত ও অজ্ঞাত ভবিষ্যতের আশায় বসে থেকো না, তার জন্য সব কাজ ঝুলিয়ে রেখো না। কারণ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই, সময়ের প্রতিটি পাত্রই কোন না কোন ব্যস্ততা, কাজ বা অপ্রত্যাশিত বিপদ- আপদে পূর্ণ হয়ে যায়।”

অবসর সময়

কীভাবে আমরা আমাদের জীবনকে অযথা ও অনর্থক কাজে ব্যয় করে চলছি! যাতে না হচ্ছে দুনিয়াবী কোন ফায়দা, আর না হচ্ছে আখেরাতী ফায়দা!! কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা কি শুধু সময়ই নষ্ট করছি, না অর্থ- সম্পদ, জ্ঞান, সুস্থতা সবকিছুই খোয়াচ্ছি? কখনো কি ভেবে দেখেছি?

সময় নষ্টের একেবারে নিকটতম পরিণতি তো এই যে, এর মাধ্যমে বহু সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায়, সম্পদের বহু উৎস নষ্ট হয়ে যায়। ভেবে দেখুন, সময় সম্পদকে যদি কেউ নষ্ট না করে এবং এর সঠিক ব্যবহারে অজ্ঞ না হয় তবে তো সে বহু পতিত ও অনাবাদি জমিকে আবাদ করতে পারে, বহু কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করতে পারে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালু করতে পারে এবং সেগুলো পরিচালনা করতে পারে- সময়ের একটি অংশ ব্যায় করে।

আর যদি বর্তমান যুগে সময় নষ্টের ও তার অপচয়ের ফল দেখা হয় তবে তা হল, গ্রন্থবিমুখতা, জ্ঞানশূন্যতা, অধ্যয়নবিরূপতা ও মূর্খতাপ্রিয়তা। বর্তমানকালে তো এমন অনেকে রয়েছে যারা মূর্খতা ও জ্ঞান শূন্যতায় কোন মর্মপীড়া ও যাতনা অনুভব করে না। তাদের দেহ শুধু সুখ-শান্তি ও আরাম আয়েশ চায়, কষ্টের পথ মাড়াতে চায় না। অথচ তারা উপলব্ধি করতে পারছে না, যে পথে তারা চলছে তা প্রকৃত পক্ষেই কষ্টের পথ, দুনিয়া ও আখেরাতে অশান্তির পথ।

সময়ের ব্যাপারে মানুষের এমন মানসিকতা ও তার প্রতি এই 'অবিচারের' ফলে জ্ঞান- বিজ্ঞানের চর্চায় দেখা দেয় অল্পে তুষ্টতা এবং শুধু সহজলভ্য অংশটুকুতেই তৃপ্ততা। শুধু গদবাঁধা পড়া লেখা ও একঘেয়ে সামান্য কাজ- যাতে না আছে কোন শ্রম-সাধনা আর না

আছে নতুন কোন চিন্তার উন্মেষ ও বিকাশের ভাবনা- এতেই পরিতৃপ্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া। এরপর ধীরে ধীরে দেখা দেয় দুর্বল ও ক্লান্ত চিন্তা এবং কাজের ভার উদ্যমী কারও উপর ছেড়ে দিয়ে অলস বসে থাকা। ভাবখানা যেন এমন, তুমিই কর ভাই, আমার আর এ ভেজালে গিয়ে কী লাভ!

আরেকটু যদি বাড়িয়ে বলা হয় যে, আমাদের অবসর সময়গুলো যেন কর্মময় সময়ের মত বিবেক নিয়ন্ত্রিত হয়, আকল-বুদ্ধি দিয়ে পরিচালিত হয়। উদাহরণ দিয়েই বিষয়টি সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক। যেমন, আমরা কাজের ক্ষেত্রে কোন না কোন লক্ষ্য নির্ধারণ করি এবং কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই কাজ করি। তেমনি ভাবে অবসর ও কর্মহীন সময়গুলোও যেন কোন না কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় হয়। যেমন, শারীরিক সুস্থতা অর্জনের জন্য শরীরচর্চামূলক বৈধ খেলাধুলা বা মানসিক তৃপ্তির জন্য কোন ইলমী মুতালা'আ কিংবা রূহানী খোরাকের জন্য কুরআন তেলাওয়াত, হাদীছ অধ্যয়ন বা নফল ইবাদত বন্দেগী ইত্যাদিতে মগ্ন থাকা। অর্থাৎ কোন একটা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যেন আমাদের অবসর সময়টা কাটে। অবসর মানে একেবারেই হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা, এমনটা যেন না হয়। অবসরেই যেন মনের শান্তি ও দেহের তৃপ্তির মত কোন কাজ করে ফেলা হয়। অবসর যেন একবারে ফায়দাশূন্য না হয়। অন্যথায় আমাদের অবসর যাপন হবে সময় নষ্ট করা; বরং বলা যায় সময়কে 'হত্যা' করা। আর সেটা তো কখনো বৈধ হতে পারে না।

সময় নষ্ট করার কতিপয় কাজ

ইন্টারনেট

সময় নষ্ট করার মাধ্যমগুলোর মধ্যে একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট, মনে রাখবেন! ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার যেমনিভাবে অসংখ্য উপকার অর্জনের মাধ্যম, তেমনিভাবে এর ভূল এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণে অগণিত ক্ষতির সম্মুখীণও হতে হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো সময় নষ্ট হওয়া। অনেকে ইন্টারনেট,

ফেইসবুক (Facebook) এবং ওয়াটস আপ (Whatsapp) ব্যবহারে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এক মুহুর্তের জন্যও মোবাইল ফোন হাত ছাড়া করে না এবং মুহুর্তে মুহুর্তে নিজের ঘুমা, জাগা, শপিং করা, ভাল খাবার দাবার এবং অন্যান্য বিষয়াদি তার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে থাকে, নির্লজ্জতা ও অশ্লিলতার সীমাতিক্রম করে পর্দাহীন নারীরাও পেছনে থাকার পক্ষে নেই, তারাও নিজেদের অযথা ছবি প্রকাশ করাকে গর্ব মনে করে থাকে। আমাদের নতুন প্রজন্ম ইন্টারনেটের খারাপ ব্যবহারে এতই লিপ্ত হয়ে গেছে যে, তারা ঘন্টার
পর ঘন্টা এতে নষ্ট করে দেয়। যদি কোনদিন ব্যবহার করতে না পারে তবে অশ্চার্যজনক চঞ্চলতা অনুভব করে এবং টাইম পাস হয় না। একটু ভাবুন তো! কোনদিন কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করতে না পারার কারণে এরূপ চঞ্চলতা ও উদাসীনতা হয়েছিলো? এমনিভাবে যদি ইশরাক ও চাশত বা তাহাজ্জুদের নফল আদায় না হওয়ার কারণে এরূপ চঞ্চলতা হয়েছিলো? আহ! যদি আমাদের কোনআনের তিলাওয়াতের ইচ্ছা ও আগ্রহ নসীব হয়ে যেতো! আহ! যদি আমাদের অধিকহারে ইবাদত করার তৌফিক নসীব হয়ে যেতো!

মোবাইল ফোন

যেরূপ ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে
অসংখ্য দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উপকারীতা অর্জিত হতে পারে, তেমনি মোবাইল ফোনের প্রয়োজনীয় ব্যবহারও আমাদের ব্যবসায়ী কর্মকান্ড, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখা, বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাৎ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে আমাদের সহায়ক। কিন্তু আমরা একে সময় নষ্ট করার সম্ভবত একটি যন্ত্র মনে করে রেখেছি, বিশেষকরে যুবক ছেলে এবং যুবতী মেয়েরা একে খারাপ এবং অযথা ব্যবহার করে পুরো পুরো দিন ভিডিও গেইম খেলা আর অযথা sms পাঠাতে থাকে, যাতে অহেতুক ঠাট্টা, প্রেম কাব্য, চরিত্র নষ্টকারী এবং অনেক সময়তো শরীয়াত বিরোধী বাক্যও হয়ে থাকে, যার

কারণে কুফরের হুকুম আবশ্যক হয়ে পড়ে। আরো যে, sms পড়ে খুশি প্রকাশ করে অন্যকেও পাঠিয়ে থাকে। মনে রাখবেন! এরূপ পুরো দিন মোবাইল ফোনের ব্যবহারের ফলে দৃষ্টিশক্তি দূর্বল হওয়া, লেখাপড়ার ক্ষতি, চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হ্রাস, টাকা ও জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট হওয়ারও কারণ হয়। যদি আমাদের নিকট মোবাইল ফোন থাকে তবে আমাদের নিজের টাকা এবং মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে এর সঠিক ব্যবহার করা উচিৎ। মোবাইল ফোনে গান শুনার পরিবর্তে নাত, তিলাওয়াত,

ফরয জ্ঞানের কোর্স, ইলমে দ্বীনে ভরপুর বিভিন্ন মূল্যবান মাধ্যম সংগ্রহ করুন।

খেলাধূলায় সময় নষ্ট করা

সময় নষ্টকারী কাজগুলোর মধ্যে একটি কাজ হলো

খেলাধূলার মন্দ অভ্যাস, বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলা ও শারীরিক কসরত আমাদের যুব সমাজের ক্ষমতা ও উপযুক্ততাকে উইপোকার ন্যায় খেয়ে যাচ্ছে। আজ যেদিকে তাকাই না কেন, খেলাধূলার অনুরাগীই দেখা যায় এবং এই আগ্রহে দক্ষতা অর্জন করে প্রসিদ্ধি লাভেরও স্বপ্ন দেখে, কেউ ক্রিকেটে আবার কেউবা ফুটবলে নাম কামাতে চায়, কেউ হকি, টেবিল টেনিসের প্রসিদ্ধ খেলোয়ার হওয়ার সোনালী স্বপ্ন দেখে, কেউবা স্নোকার, কেরাম বোর্ডে নিজেকে চ্যম্পিয়ান মনে করে, কেউবা ঘুড়ি উড়ানো, জুয়া, তাস এবং আরো না জানি কেমন কেমন আজব আজব খেলার সৌখিন দেখা যায়। ক্রিকেটের অনেক আগ্রহীকে এমনও দেখা যায় যে, সারা রাত ক্রিকেট খেলে, চিৎকার চেচামেচি করে এবং মুসলমানের বিশ্রামে বাঁধার সৃষ্টি করে। আর ফযরের নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে এবং সারা দিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়।

খারাপ কাজে লিপ্ত থাকা ও খারাপ সঙ্গ

যারা সময়ের মূল্য সম্পর্কে জানে, তারা সময়কে নষ্ট করার পরিবর্তে নিজের প্রত্যেকটি কাজ সঠিক সময়ে করার প্রতি অভ্যস্ত হয়। তাঁদেরকে সমাজে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং যারা অলসতার কারণে নিজের কাজকেই দেরীতে করে থাকে, তারা কোন উল্লেখযোগ্য মর্যাদা অর্জন করতে পারে না এবং নিজের সময়কে আলাদাভাবে নষ্ট করে দেয়। অনেকের কাজে তো এমন মনে হয় যে, যেন তাদের জীবনের কোন উদ্দেশ্যও নাই, বন্ধুদের সাথে অলিতে-গলিতে, মহল্লায়-বাজারে খারাপ কাজে লিপ্ত থাকা, প্রতিদিন নিজের সময় ও টাকা খরচ করে বিনোদনের স্পটে যাওয়া এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া, গলির কোণে, চায়ের দোকানে ঘন্টার পর ঘন্টা অযথা গল্পগুজব করা, সারা দিন সিনেমা দেখা, কানে হেড ফোন লাগিয়ে দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে গান শুনা ইত্যাদি কাজ করে তো মনে হয় যে, আমরা আমাদের জীবনের লক্ষ্যকেই একেবারে ভুলে গেছি বা আমরা জানিও না যে, আমাদের জন্মের উদ্দেশ্য কি। মনে রাখবেন! আমাদের এই জীবন একারণে দেয়া হয়নি যে, আমরা একে দুনিয়ার রং তামাশা ও আনন্দ বিহ্বলতায় অতিবাহিত করবো, বরং আমাদের আল্লাহ্ তাআলার ইবাদত এবং তাঁর আহকামের ইপর আমল করা ও তাঁর অবাধ্যতা মূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্যই দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। আমরা এই সুযোগ নিশ্বাস অব্যাহত থাকা পর্যন্তই পাবো।

সময়ের গুরুত্ব দেয়ার পদ্ধতি

এতক্ষণ আমরা সময় নষ্টকারী কাজ এবং সময়ের গুরুত্ব প্রদানকারীদের বাণী পাঠ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। যা পড়ে সময়ের গুরুত্ব প্রদানের উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে হয়তো। এই উৎসাহকে আরো বৃদ্ধি করতে কয়েকটি এমন পদ্ধতি পাঠ করি, যার উপর আমলের বদৌলতে আমাদের দৃঢ়তা নসীব হতে পারে।

* মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং প্রয়োজনে সাধারণ এবং সস্তা মোবাইল ব্যবহার করুন। যথাসম্ভব লিখে কথা বলার অভ্যাস গড়ুন, নতুবা অল্প শব্দে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করুন।

* সময়ের গুরুত্বের চেতনা বাড়ানোর জন্য নিজেকে অধিক পরিমাণ নেকীর কাজে ব্যস্ত রাখুন এবং পুরো দিনের একটি রুটিন বানিয়ে নিন, যাতে অহেতুক এবং সময় নষ্টকারী কাজ অন্তর্ভূক্ত থাকবে না। ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে সম্ভব হলে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন। ঘরের এবং বাইরের লোকদের ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিন। ফযরের নামাযের পর কুরআনে করীমের তিন আয়াত তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর সহ শুনে এর বরকত অর্জন করুন,

এবং ইশরাক ও চাশতের নফলও আদায় করুন। ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। এর মাঝে যোহর ও আসরের নামায জামাআত সহকারে আদায়

করুন, মাগরীবের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর আওয়াবীনের নফলও আদায় করুন, অতঃপর ইশার নামাযের পর অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ুন, অকারণে বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকাতে ফযরের নামাযের জন্য উঠতে অলসতা হবে। এই রুটিন ছাড়াও পুরোদিন অযথা কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য অবসর মুহুর্তগুলোতে অধিকহারে যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠ করুন এবং পরিবার পরিজনদেরও এর উৎসাহ দিন।সময়কে কাজে লাগানোর এই মহাপুরস্কারের কারণেই আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ অনুতপ্ত হয়েছেন। কোনো ব্যবসায়িক চুক্তি বা দুনিয়ার কোনো কিছু হারিয়ে ফেলে অনুতপ্ত হননি। বরং তিনি নিজেই বলছেন যে, 'আমি সেদিনের মতো আর কোনো দিন কোনো কিছুর জন্য অনুতপ্ত হইনি, যেদিন সূর্য ডুবে গিয়েছিল, অথচ আমার আমলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি।'

সময় তো একের পর এক অতিবাহিত হয়েই যাচ্ছে। সুতরাং যেই মুহূর্তটি আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অতিবাহিত করা হয়নি, সেটি পরিত্যক্ত ও নষ্ট হয়ে গেল।

যা আর কখনো ফিরে আসবে না। আর যেই মুহূর্তগুলোতে কোনো না কোনোভাবে আল্লাহ তাআলার হুকুম পালন করা হয়, সেই মুহূর্তগুলোই অত্যন্ত দামি ও লাভজনক। যেমনটি সুলাইমান আত-তামিমির মাঝে ছিল। তাঁর ব্যাপারে বলা হয়, তাঁর
এমন কোনো মুহূর্ত অতিবাহিত হতো না যে, তিনি সে সময় কোনো না কোনো সদাকা করেননি। আর যদি সদাকা করার মতো কিছু না থাকত, তাহলে তিনি দুই রাকআত নামাজ পড়তেন এবং এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

'হে রাসুলগণ, পবিত্র বস্তু আহার করো এবং সৎকাজ করো।

কি ভাবে সময়কে কাজে লাগবে এমন আরো কিছু আমল

১. বারো রাকআত সুন্নাতে মুআক্কাদার সালাত আদায় : দিন ও রাতে মোট ১২ রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করতে হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এগুলোর প্রতি যত্নবান হবে, আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার জন্য একটি বাড়ি নির্মাণ করবেন। হাদিসেও এমনটিই বর্ণিত আছে।

২ .

কুরআন তিলাওয়াত : নিয়মিত কুরআনে কারিম থেকে
৪/৬/১০ পৃষ্ঠা করে নির্দিষ্ট একটি অংশ তিলাওয়াত আবশ্যক করে নেওয়া। যার পক্ষে যতটুকু তিলাওয়াত করা সম্ভব, ততটুকু তিলাওয়াত করা চাই। তোমার যতই ব্যস্ততা থাকুক না কেন, কখনো কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দিয়ো না। বরং প্রতি মাসে তোমার নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়েও এক পৃষ্ঠা বা সাধ্যমতো বেশি পড়ার চেষ্টা করবে, যাতে এভাবে বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় তুমি দৈনিক এক পারা পরিমাণ তিলাওয়াত করতে পারো। এক পারা কুরআন তিলাওয়াত করা তোমার একটা গেম খেলার সময়ের এক-তৃতীয়াংশও হবে না, আর একটি ফিল্ম দেখার সময়ের সাথে তুলনা করলে তো তার এক-চতুর্থাংশও হবে না।

৩. হিফজুল কুরআন: পবিত্র কুরআনে কারিমের

তিলাওয়াতের পাশাপাশি প্রতিদিন একটু একটু করে মুখস্থ করা। যাতে জান্নাতে প্রবেশ করার পর ফেরেশতারা তোমাকে বলতে পারে যে, পড়ো আর ওপরের দিকে উঠতে থাকো। অতঃপর তুমি একেকটি আয়াত তিলাওয়াত করবে আর ওপরের দিকে আরোহণ করতে থাকবে। এভাবে তোমার মুখস্থ থাকা শেষ আয়াতটি তিলাওয়াত করা পর্যন্ত উঠতেই থাকবে।

৪. এক রাকআত হলেও বিতরের সালাত আদায় করা।

৫. চাশতের সালাত আদায় করা আমাদের দেহের ৩৬০ জোড়ার দৈনন্দিন আবশ্যকীয় সদাকার পরিবর্তে চাশতের দুই রাকআত সালাতের বৈধতা আরোপ করা হয়েছে। পুরো দেহের অর্থাৎ এই ৩৬০ জোড়ার সদাকা হিসেবে সামান্য এই দুই রাকআত সালাতই যথেষ্ট। এটি কোনো কষ্টসাধ্য বিষয় নয়। অথচ অধিকাংশ মানুষ তা থেকে গাফিল।

৬. শাওয়াল, আশুরা, আরাফা এবং প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবার নফল সিয়ামগুলো পালন করা।

৭. বেশি বেশি সদাকা করা: তালক বিন হাবিব প্রত্যেক সালাতের সময় সদাকার জন্য কিছু না কিছু নিয়ে বের হতেন। যদি কিছু না পেতেন, তাহলে তিনি পেঁয়াজ নিয়ে যেতেন আর বলতেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً

'হে মুমিনগণ, তোমরা যখন রাসুলের সাথে একান্তে

কথা বলতে চাও, তখন তোমাদের এরূপ কথার পূর্বে কিছু সদাকা দাও।

সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছু চাওয়ার আগে কিছু সদাকা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল।

৮. প্রতিদিন হজ-উমরা পালন করা: কেননা নবি কারিম ইরশাদ করেছেন:

'যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামাআতের সাথে আদায় করার পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর জিকির করে, অতঃপর দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তার জন্য একটি হজ ও উমরার সাওয়াব লিপিবদ্ধ হয়।' বর্ণনাকারী বলেন, রাসুল বলেছেন, 'পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ তিন বার বলেছেন (হজ ও উমরার সাওয়াব)।

৯. দাওয়াহ ইলাল্লাহর কাজ করা: সমস্ত নবি-রাসুলের রিসালাতের একটি গুরুদায়িত্ব ছিল আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করা। আর আল্লাহ তাআলাও নবি- রাসুলদের তাঁর এই বাণীর ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তা নিয়ে গর্ববোধ করতে বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي

'বলে দিন, "এই আমার পথ মাধ্যমে। । আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দিই আমি এবং আমার অনুসারীরা।" (সুরা ইউসুফ: ১০৮)

যে ব্যক্তি অন্যের কল্যাণে নিজের সময় ব্যয় করে, আল্লাহ তাআলা তার সময়ের মধ্যে বরকত দান করেন। ফলে অন্যরা যেই কাজ করতে কয়েক মাস বা বছর লেগে যায়, তার সে কাজ সম্পাদন করতে মাত্র কয়েকদিন বা সপ্তাহ ব্যয় হয়।

১০. মসজিদে ইলমি মজলিশে উপস্থিত থাকা: মসজিদের কোনো একটি ইলমি দরসে উপস্থিত হলে একটি পরিপূর্ণ হজের সাওয়াব পাওয়া যায়। রাসুল (সাঃ)ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি কোনো কল্যাণকর বিষয় শেখার জন্য অথবা শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রত্যুষে মসজিদে গমন করে, তাহলে তার জন্য এমন একজন হাজির হজের সমপরিমাণ সাওয়াব দান করা হবে, যে তার হজকে পরিপূর্ণ করতে পেরেছে।

কথিত আছে, জনৈক কাঠুরে বনে কাঠ কাটছিল। কিন্তু তার কুঠারটিতে মোটেও ধার ছিল না। কারণ সে কাঠ কাটতে আসার পূর্বে সেটিতে ধার দেয়নি। তখন তার পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি যাওয়ার সময় এই অবস্থা দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন কুঠারে ধার দিচ্ছ না?' কাঠুরে তার কাজ চালিয়ে যেতে যেতেই বলল, 'আমার সময় নেই। তাই ধার দিচ্ছি না!!' আমাদের মাঝে এমন অনেকে আছে। যারা খুবই ব্যস্ত সময় পার করছে। কিন্তু সময়গুলোকে বণ্টন করে নেওয়ার মতো সামান্য সুযোগ তার হয়ে ওঠে না। তার অবস্থা গল্পের কাঠুরের মতোই। যদি সে কুঠারে ধার দিয়ে নিত, তাহলে কিছুটা দ্রুততার সাথে গাছটি কাটতে পারত। কষ্টও কম হতো আর একটি গাছ কেটে আরেকটি গাছও কাটা যেত।

আফসোস সেসব মানুষের জন্য, যারা ব্যস্ততার মধ্যকার সময়গুলোকে কাজে না লাগিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতের দিক থেকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিমরা হলো সময়কে কাজে লাগানোর জন্য অধিক হকদার, কিন্তু আজ তারাই সবচেয়ে বেশি সময় নষ্ট করছে! আমরা অপচয় করা সময়গুলোকে আর নষ্ট না করে জীবনের সাথে আরও একটি জীবন যুক্ত করি।

যেমন: কারও সাথে সাক্ষাতের সময়, কোনো কাজের জন্য অপেক্ষার সময়, ডাক্তারের সাথে সাক্ষাতের পূর্বের সময়, চুল কাটার পূর্বের অবসর সময় এবং বিশ্রামের সময়। এই সময়গুলোকে কাজে লাগিয়ে জীবনের মাঝে ভিন্ন একটি জীবন খুঁজে পাব আমরা।

দুঃখিত, সময় ফুরিয়ে গেছে!

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমে মানুষের দুটি অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন। যেখানে মানুষ চূড়ান্তভাবে পরিতাপ করবে, হা-হুতাশ করবে অতীতের নষ্ট হওয়া
সময়গুলো নিয়ে এবং প্রতিটি সময়ের মূল্য হাড়ে হাড়ে অনুভব করবে। কিন্তু তার এই পরিতাপ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।

প্রথম অবস্থান হলো, মৃত্যুর সময়। তখন অবহেলাকারীরা চিৎকার করে বলতে থাকবে

حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

'যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে,'হে আমার পালনকর্তা, আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ করুন। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি।' (সুরা আল-মুমিনুন: ৯৯-১০০)

দ্বিতীয় অবস্থান হলো, আখিরাতে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ

'আর যেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদের সমবেত করবেন, যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি অবস্থান করেনি।

তারা একে অপরকে চিনতে পারবে।' (সুরা ইউনুস: ৪৫)।

যারা দুনিয়াতে সময়কে গুরুত্ব দেয়নি, আল্লাহর দেওয়া নির্ধারিত সময়ে আমলে সালেহের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত করেনি; কিয়ামতের দিন তারা আর্তনাদ করে কিছু সময় চাইবে! কিন্তু তাদের কোনো সময় দেওয়া হবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٣٧﴾

'সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবে : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের এখান থেকে বের করুন। এত দিন আমরা যে আমল করেছি, তার পরিবর্তে আমরা এখন নেক আমল করব। আল্লাহতায়ালা বলবেন : আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত? তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীরাও এসেছিল।' (সুরা ফাতির : ৩৭)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস থেকেও আমরা এ নির্দেশনা পাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যদি কিয়ামত এসে উপস্থিত হয় আর তোমাদের কারো হাতে একটা গাছের চারাও থাকে, তোমরা সুযোগ পেলে তা রোপণ করো।' (মুসনাদে আহমদ)

আমাদের একটি দিনের একটি মুহূর্ত চলে যাওয়ার মানে হলো, আমাদের জন্য নির্ধারিত আয়ুর একটি অংশ অতিবাহিত হয়ে গেছে।

কবি বলেন:

'যেদিন তুমি দোলনায় ছিলে, সেদিন থেকেই আমি তোমাকে অপূর্ণতায় দেখছি,
তখন থেকেই তোমার একেকটি মুহূর্ত তোমাকে কবরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।'

হ্যাঁ! বাস্তবতা এমনই। আমাদের একেকটি নিশ্বাস আমাদের মৃত্যুর খুব কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা জানিও না, সেই মৃত্যু আমাদের কখন সংঘটিত হবে? সুতরাং বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার কাজ কি এই নয় যে, হঠাৎ করে মৃত্যু গ্রাস করার পূর্বেই তার জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রাখা। একদিন উমর বিন আব্দুল আজিজ লোকজনকে নিয়ে এক জায়গায় বসা ছিলেন। যখন দ্বিপ্রহর হলো, তখন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন এবং বিরক্তিবোধ করলেন।

তাই উপস্থিত লোকজনকে বললেন, 'আমি আসা পর্যন্ত আপনারা এখানেই অবস্থান করবেন।' অতঃপর তিনি তার ঘরে প্রবেশ করলেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার জন্য। এমন সময় তার ছেলে আব্দুল মালিক এসে উপস্থিত লোকজনকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, 'তিনি ঘরের ভেতরে গিয়েছেন।' অতঃপর তিনি অনুমতি চেয়ে বাবার কাছে প্রবেশ করে বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, কেন আপনি ঘরে প্রবেশ করেছেন?' তিনি বললেন, 'কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে এসেছি।' ছেলে বলল, 'আপনি এখানে বিশ্রাম নিচ্ছেন আর প্রজারা বাইরে আপনার অপেক্ষায় আছে, আপনি কি নিশ্চিত যে, এই অবস্থায় আপনার মৃত্যু আসবে না?!' সাথে সাথে উমর বিন আব্দুল আজিজ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং মানুষের কাছে চলে গেলেন।

তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো সময়ের প্রতিটা অংশকে কোনো না কোনো উপকারী কাজে ব্যয় করা, দুনিয়ার ব্যস্ততার মাঝেও পরকালীন পাথেয় সংগ্রহ করা, আল্লাহর তাসবিহ পাঠ করা, কোরআন তিলাওয়াত করা, কল্যাণকর জ্ঞানার্জন করা। অবসর সময়ে ব্যস্ততার সময়ের মূল্যায়ন করা। অবসর সময়কে গণিমত মনে করে কাজে লাগানো; যেন সময়ের ক্ষুদ্র মুহূর্তও বিফলে না যায়।তাই আর নয় সময় অপচয়, সময়ের কাজ সময়ে করি, তবেই সময় হয়ে উঠবে আলোকময়, আমাদের জীবন ভরে উঠবে সোনালি সাফল্যের মোড়কে, হবে যথার্থ এবং কল্যাণকর।

কবি বলেন:

'জীবন তো কেবল একটি রাত মাত্র। যার পরে আবার দিন আসে এবং দিনের পরে দিন আর মাসের পরে মাস আসে।

এই সময়গুলো একটি আরোহণযোগ্য বাহনের মতো। যেগুলো নতুন নতুন প্রাণগুলোকে ধীরে ধীরে পুরাতন করে দিচ্ছে, সুস্থ সবল মানুষের দেহের অংশগুলোকে কবরের কাছাকাছি করে দিচ্ছে।

সময় সকলকেই ক্রমান্বয়ে নিয়ে যায়, আবার কাউকে রেখে যায় অন্যের জন্য, আর তারা এমনভাবে বণ্টন করে যায়, যাতে কেউ বাদ না পড়ে।'